বিভুরঞ্জন সরকার

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এসে গেছে। নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতিও নিশ্চয়ই প্রায় সম্পন্ন। আজ ৮ নভেম্বর নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে। তফসিল ঘোষণার ৪৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা। এবার নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়েও অনিশ্চয়তা, আশঙ্কা ছিল। এখনও সেটা পুরোপুরি দূর হয়েছে তা বলা যাবে না। নির্বাচন নিয়ে সংশয়ের প্রধান কারণ দেশের অন্যতম বড় রাজনৈতিক দল বিএনপির নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতা। এখনও অবশ্য বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দেয়নি, তবে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, বিএনপির মধ্যে নির্বাচনবিরোধী একটি অংশ প্রবলভাবে সক্রিয় থাকলেও বিএনপি এবার নির্বাচনে যাবে। আর যদি শেষ পর্যন্ত বিএনপি নির্বাচন থেকে দূরে থাকে তাহলেও দেশে নির্বাচন হবে এবং এবার নির্বাচন কোনোভাবেই একতরফা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন হবে না। বিএনপি নির্বাচন না করলেও এবার অন্য দলগুলো নির্বাচন করবে বলেই মনে হচ্ছে।

আগামী নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক ও সুষ্ঠু হোক- সেটা সবাই চাইছেন। দশম সংসদ নির্বাচন হয়েছিল একটি বিশেষ অবস্থার মধ্য দিয়ে। আইনিভাবে ওই নির্বাচন বৈধ বা সিদ্ধ হলেও নানা কারণে সেই নির্বাচন ছিল প্রশ্নবিদ্ধ ও বিতর্কিত। সরকারও সেটা জানে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকারের মেয়াদ পূর্ণ করতে কোনও সমস্যা হলো না। নির্বাচনের এক বছরের মাথায় বিএনপি-জামায়াত সরকার পতনের সহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে দুর্বল করতে গিয়ে নিজেরাই দুর্বল হয়েছে, তাদের জনবিচ্ছিন্নতা বেড়েছে। প্রধান বিরোধী দলের দুর্বল অবস্থান সরকারকে শক্তি জুগিয়েছে।

দেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের প্রাধান্য প্রবল হয়ে উঠলেও অনেকে এরমধ্যে একদলীয় শাসনের আশঙ্কা দেখলেও অন্য কোনও দল সামনে এগিয়ে আসতে পারেনি। বিএনপিকে সরকার চাপের মধ্যে রাখছে এটা যেমন ঠিক, তেমনি বিএনপিও এমন রাজনীতি করেনি, যার জন্য মানুষ তাদের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ার গরজ বোধ করবে। সরকার মেয়াদকালে দৃশ্যমান অনেক উন্নয়ন করেছে, নানা সামাজিক উন্নয়ন সূচকেও বাংলাদেশের অগ্রসর অবস্থান বিশ্ব সম্প্রদায়ের নজর কেড়েছে, প্রশংসা কুড়িয়েছে। কিন্তু সুশাসনের প্রশ্নে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও বিকশিত করার ক্ষেত্রে সরকার সমালোচনা এড়াতে পারেনি। তবে সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনাটা যে সরকার বা সরকারি দলের ওপর এককভাবে নির্ভর করে না, এটাও অস্বীকার করার মতো না।

বিএনপি কোনোভাবেই রাজনীতির চালকের আসনে নেই। দলের প্রধান নেত্রী খালেদা জিয়া কারাগারে। তার মুক্তির দাবিতে জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে বিএনপি। নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকারবিরোধী সব রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি লাগাতার চেষ্টা বিএনপির ছিল। কিন্তু সরকার বা আওয়ামী লীগকে একঘরে বা বন্ধুহীন করার চেষ্টায় বিএনপি বড় সাফল্য পেয়েছে তা বলা যাবে না। ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ড. কামাল হোসেনকে সামনে রেখে ছোট ছোট দলগুলোকে এক ছাতার নিচে আনার চেষ্টা আংশিক সফল হয়েছে। তবে বি. চৌধুরী ও কামাল হোসেনের ‘দুটি পথ দুটি দিকে গেছে বেঁকে’।

কামাল হোসেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠন করে মিডিয়ায় যতটা সাড়া ফেলতে পেরেছেন, চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন, বাস্তবে মাঠপর্যায়ে এই ঐক্য বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পেরেছে বলে মনে হয় না। কারণ যেসব দল ও ব্যক্তি নিয়ে ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়েছে তৃণমূল পর্যায়ে তাদের সাংগঠনিক কাঠামো কিংবা জনসমর্থন কোনোটাই নেই। ঐক্যফ্রন্ট কার্যত বিএনপির একটি নতুন বর্ধিত প্ল্যাটফরম।

জামায়াতের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে শরিকদের সঙ্গে বিএনপির টানাপোড়েন আছে। তীব্র হাসিনা বিরোধিতাকে সম্বল করে জোড়াতালির যে ঐক্য সেটা বিএনপিকে কী অর্জনে সাহায্য করবে বলা কঠিন। তবে ঐক্যফ্রন্ট গঠনের পর রাজনীতিতে একটি বড় অগ্রগতি আছে। ঐক্যফ্রন্টের পক্ষ থেকে ড. কামাল হোসেন প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে সংলাপের প্রস্তাব দিলে প্রধানমন্ত্রী নাটকীয়ভাবে তাতে সম্মতি জানান। গণভবনে আন্তরিক পরিবেশে বিএনপি নেতাদেরসহ ঐক্যফ্রন্টের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপিসহ ঐক্যফ্রন্টের সাত দফার ব্যাপারে, বিশেষ করে নির্বাচনের আগে সংসদ ভেঙে দেওয়া, খালেদা জিয়ার মুক্তি, তত্ত্বাবধারক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ইত্যাদি মূল দাবিগুলোর ব্যাপারে সরকারি মনোভাবে কোনও নমনীয়তা দেখা যায়নি। তবে উভয়পক্ষ সরাসরি কথা বলায় রাজনৈতিক পরিবেশ শীতল হয়েছে। সরকার যে বিএনপিকে বড় কোনও ছাড় দেবে না সেটা বোঝা যাচ্ছে।

আলোচনায় বসে বিএনপির জন্য বিশেষ কোনও প্রাপ্তি না ঘটলেও সরকারের অর্জন ভালো। সরকার যে বিএনপিকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে চায় না, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে যে তাদের আগ্রহ আছে, এটা সবাইকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে সরকার। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাবমূর্তিও আরও উজ্জ্বল হয়েছে। ৭

নভেম্বর আবার ঐক্যফ্রন্টের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আলোচনায় বসবেন। ওই আলোচনার পরই হয়তো বিএনপির সিদ্ধান্ত জানা যাবে। খালেদা জিয়ার মুক্তির ব্যাপারে একটা ‘সমঝোতা’ হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। বিএনপি বিজয়ের মুড ফিরে পায়- এমন কোনও সুযোগ সরকার দেবে কিনা সেটাই এখন দেখার বিষয়।

বিএনপি যতই বলুক না কেন যে সাত দফা না মানলে তারা নির্বাচনে যাবে না কিন্তু বাস্তবে তারা হয়তো এই অবস্থানে অটল থাকতে পারবে না। সরকার সবদিক থেকেই সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে বিদেশিদের সহানুভূতির জন্যে পথ প্রশস্ত হয়েছে। আবার আওয়ামী লীগবিরোধী বলে পরিচিত বিএনপির ভোট ব্যাংক কওমি মাদ্রাসার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েও শেখ হাসিনা তাদের সমর্থন লাভের আশা করছেন। কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরের সনদের সরকারি স্বীকৃতি দিয়ে সংসদে আইন পাসের পর প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শোকরানা মাহফিলের আয়োজন করে কয়েক লাখ মানুষের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যাপক প্রশংসা ও স্তুতি করা হয়েছে। তাকে ‘কওমি জননী’ উপাধিও দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী তাদের কাছে দোয়া চেয়েছেন। মাহফিলে হেফাজতে ইসলামের প্রধান শাহ আহমদ শফী বলেছেন, কওমি সনদের আইন পাস করে প্রধানমন্ত্রী যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছেন।

অবশ্য হেফাজতিদের প্রতি সরকারের এই নমনীয়তার সমালোচনাও হচ্ছে। ভোটের রাজনীতিতে সাময়িক সুবিধা পাওয়ার জন্য হেফাজতিদের প্রশ্রয় দিয়ে দেশে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারাকেই দুর্বল করা হচ্ছে বলেও অনেকে মনে করেন। মাওলানা আহমদ শফীকে স্বাধীনতা পদক দেওয়ার যে দাবি উঠেছে তা মেনে নেওয়া হলে অনেকের মধ্যেই তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। তবে সরকার এটা জানে যে, যারা হেফাজতের সঙ্গে সরকারের দহরম-মহরমের সমালোচক তাদের সংগঠিত হওয়ার শক্তি হেফাজতের চেয়ে বেশি নয়। আর ভোটকে সামনে রেখে আদর্শের চেয়ে ভোটের হিসাব মাথায় রেখেই সরকার চলবে। ভোট এসে গেছে। আবার জিতে ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য আওয়ামী লীগ সম্ভাব্য সবকিছুই করবে। এটা তো জানা যে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ হারলে বাস্তবে হারবে বাংলাদেশ।

লেখক: কলামিস্ট